মূলপাতা

পূজারি ও পূজিত

Asif Adnan

February 28, 2021

24 MIN READ

১.

উল্টানো পেন্টাগ্র্যাম খোদাই করা সিংহাসনে বসা মূর্তিটার শরীর মানুষের, মাথা ছাগলের। বাঁকানো দুই শিং, মাঝে জ্বলন্ত মশাল। কাঁধের পেছন থেকে বেরিয়ে আছে এক জোড়া পাখা। পেশিবহুল হাতগুলোর একটা আকাশ আর অন্যটা মাটির দিকে তাক করা। ভাঁজ করা দুপায়ের পাতার জায়গায় পশমি খুর। দুপাশে দাঁড়ানো দুটো শিশু। মুখ তুলে কালো দেবতার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে দুজনেই।

কালো ব্রোঞ্জের তৈরি ভাস্কর্যটা সাড়ে আট ফিট লম্বা, ওজন প্রায় ১ টনের মতো। নাম ব্যাফোমেট।

ব্যাফোমেটের সাথে ইউরোপের পরিচয় মধ্য যুগে, ক্রুসেইডের সময়কার রহস্যময় নাইটস টেম্পলারদের সুবাদে। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে ১৩০৭ এ বিচার শুরু হয় ক্যাথলিক চার্চের একসময়ের চোখের মণি নাইটস টেম্পলারদের। সমকামিতা, ব্ল্যাক ম্যাজিক, জ্বিনসাধনা এবং ব্যাফোমেট নামের ছাগলমুখো দেবতার উপাসনা–টেম্পলারদের বিরুদ্ধে অভিযোগের লিস্ট ছিল লম্বা এবং বিচিত্র।

মধ্যযুগে ইউরোপে পরিচিতি পাওয়া ব্যাফোমেট নামের 'সত্তা' আধুনিক যুগে পরিণত হয়েছে পশ্চিমা ব্ল্যাক ম্যাজিক, জ্বিনসাধনা এবং শয়তান উপাসনের প্রতীকে।

অ্যামেরিকার ডেট্রয়েট নদীর কাছাকাছি এক পরিত্যক্ত কারখানার ওয়্যারহাউসে মধ্যরাতের ঠিক আগে পর্দা উন্মোচন করা হয় শতাব্দী পুরোনো ব্যাফোমেটের সম্মানে তৈরি নতুন এই ব্যাফোমেট মূর্তির। দিনটি ছিল ২০১৫ এর জুলাইয়ের এক শনিবার। মূর্তিটা বানায় 'স্যাইটানিক টেম্পল' (Satanic Temple, শয়তানি মন্দির) নামের এক সংগঠন। অ্যামেরিকাতে ওরা নিবন্ধিত একটা ধর্ম হিসেবে। নামে শয়তানি মন্দির হলেও এ সংগঠনের লোকজন সরাসরি সত্তা হিসেবে শয়তানের উপাসনা করে না। বিশ্বাসের দিক থেকে ওরা এনলাইটেনমেন্ট হিউম্যানিস্ট, পাক্কা ভোগবাদী। 'সবার ওপর মানুষ সত্য তাহার ওপর নাই', 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আদালত হলো মানুষের বিবেক', 'মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক'–টাইপ লোকজন। শয়তান তাদের কাছে একটা সিম্বল, একটা 'সাহিত্যিক চরিত্র'। যুক্তি, স্বাধীনতা আর প্রথাবিরোধিতার প্রতীক। ব্যাফোমেট হলো শয়তানের প্রতীক।

শয়তানি মন্দিরের ভাষ্যমতে ব্যাফোমেটের মূর্তি বানানোর উদ্দেশ্য উপাসনা না; বরং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির চর্চা। ২০১২ সালে অ্যামেরিকার ওকলামহোমা রাজ্যের ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের সামনে স্থাপন করা হয় বাইবেলের দশ আজ্ঞা-সংবলিত 'টেন কমান্ডমেন্টস মনুমেন্ট' নামের একটি ভাস্কর্য। শুরু থেকেই এ নিয়ে দেখা দেয় বিতর্ক। অন্য সব ধর্মকে বাদ দিয়ে সেক্যুলার দেশের সরকারি ভবনের সামনে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের ভাস্কর্য স্থাপনকে অনেকেই দেখেন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির লঙ্ঘন হিসেবে। এ বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালে স্যাইটানিক টেম্পল। খুব সহজ কিন্তু শক্তিশালী এক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তারা তাদের যুক্তি সাজায়–'রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ব্যবহার করে খ্রিষ্টানরা যদি তাদের ধর্মের প্রচারণা চালাতে পারে, তাহলে অন্য ধর্মের লোকেরা কেন পারবে না?'

সেক্যুলার দেশে তো অন্য ধর্মের অনুসারীদেরও একই অধিকার থাকার কথা। শুধু সংখ্যাগুরুর ধর্মের নিরাপত্তা আর অধিকার দেয়া হলে সেটাকে তো আর ধর্মনিরপেক্ষতা বলা যায় না। খ্রিষ্টানরা যদি নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী বাইবেলের দশ আজ্ঞা লেখা ভাস্কর্য বসাতে পারে, তাহলে শয়তান উপাসকদেরও অধিকার আছে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যাফোমেট মূর্তি বসানোর। আর

এতে বাধা দেয়া হলে সেটা হবে বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আইনের চোখে সমানাধিকারের নীতির লঙ্ঘন।

এ যুক্তি অনুযায়ী শয়তানি মন্দিরের সদস্যরা ব্যাফোমেট মূর্তি নিয়ে হাজির হয় অ্যামেরিকার বিভিন্ন সরকারি ভবনের প্রাঙ্গণে। স্বভাবতই খ্রিষ্টানদের দিক থেকে আসে তীব্র প্রতিবাদ। এসব প্রদর্শনীর সময় অনেককে স্লোগান দিতে শোনা যায়–'শয়তানের কোনো অধিকার নেই!'

প্রথমবার দেখায় ব্যাফোমেট মূর্তি নিয়ে এ পুরো ঘটনাকে হয়তো পাগলাটে অ্যামেরিকানদের আরেকটা আজগুবি কাজ মনে হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে তাকালে বোঝা যায় এ ঘটনা আসলে ধর্ম ও আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের সামনে হাজির করে গভীর কিছু প্রশ্ন। সব ধর্ম ও বিশ্বাস পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ না; বরং অনেকগুলোই একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক। যা এক ধর্মের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা সেটা অন্য ধর্মের কাছে ধর্মদ্রোহিতা। যেমনটা ব্যাফোমেট মূর্তির ঘটনা থেকে স্পষ্ট। এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে? রাষ্ট্র কি অধিকাংশের পক্ষ নেবে? তাতে কি সংরক্ষিত হবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি? রাষ্ট্র কি স্যাইটানিল টেম্পলের যুক্তি মেনে নেবে? যদি মেনে নেয়, তাহলে কি খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা বলা যায় না যে রাষ্ট্র ধর্মদ্রোহিতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে? শয়তানি করার বিশ্বাসকে রাষ্ট্র নিরাপত্তা দিচ্ছে?

এখন কেউ হয়তো বলতে পারেন যে স্যাইট্যানিক টেম্পলের দাবি গ্রহণযোগ্য না, কারণ তারা সত্যিকার অর্থে কোনো ধর্ম না। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে, 'সতিকার অর্থে' ধর্মের সংজ্ঞা কী? ধর্মের সংজ্ঞা দেয়াটা আসলে কিন্তু অতটা সহজ না। এটাও হয়তো বলা যেতে পারে যে, ব্যাফোমেট মূর্তির ব্যাপারটা আসলে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী একটা ঘটনা আর ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণ হতে পারে না। এ ঘটনা থেকে সব সেক্যুলার রাষ্ট্র বা সেক্যুলারিযমের নীতির ব্যাপারে কোনো উপসংহার টানা ঠিক হবে না।

কিন্তু এ রকম আরও উদাহরণ আছে। আমাদের কাছে, আমাদের ঘরেই আছে।

২.

২.

১৮৩৫ সালে ভারতের অমৃতসারের কাদিয়ানে জন্ম হয় মির্যা গোলাম কাদিয়ানির। এ লোক প্রথমে দাবি করে সে ইসলামের একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক), তারপর দাবি করে সে আল-মাহদী এবং তারপর দাবি করে সে প্রতিশ্রুত মসীহ। শেষমেশ দাবি করে বসে তার কাছে ওহী আসে, সে আল্লাহর প্রেরিত নবী। তবে সে নতুন কোনো শরীয়াহ আনেনি, হারুন আলাইহিস সালাম যেমন মুসা আলাইহিস সালামের অনুগামী নবী ছিলেন তেমনি সেও খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াহর অনুগামী নবী। মির্যা গোলামের অনুসারীরা কাদিয়ানি হিসেবে পরিচিত, যদিও তারা নিজেদের 'আহমাদি' বলে দাবি করে। শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা নানাভাবে কাদিয়ানিদের সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে। মির্যা গোলাম এক অর্থে ছিল ব্রিটিশদের এজেন্ট এবং তার উত্থানের পেছনে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সক্রিয় ভূমিকা। পরবর্তীকালে এ লিস্টে যুক্ত হয়েছে অ্যামেরিকাও। আজও কাদিয়ানিদের মূল হেডকোয়ার্টার লন্ডনে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা এবং মির্যা গোলামকে নবী মনে করা কাফির কাদিয়ানিরা নিজেদের মুসলিম দাবি করতে চায়।[1] আরও অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে সারা দুনিয়াজুড়ে ইসলামের বিরোধিতা ও মুসলিমের অধিকার হরণে ব্যস্ত যায়নিস্ট-ক্রুসেইডাররা কাদিয়ানিদের 'মুসলিম হবার অধিকার' নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন! কাদিয়ানিদের পক্ষে নিয়মিত লবিয়িং করা হয় ব্রিটেন-অ্যামেরিকা থেকে।

একেবারে শুরু থেকেই কাদিয়ানিদের বিরোধিতা করে আসছেন উপমহাদেশের আলিমগণ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যানারে কাদিয়ানি-বিরোধী আন্দোলন করেছেন বাংলাদেশের আলিমরাও। কিছুদিন আগেও ২০১৯ এর ফেব্রুয়ারিতে কাদিয়ানিরা পঞ্চগড়ে 'জলসা' এবং 'মহাসমাবেশ' করার উদ্যোগ নিলে এর তীব্র বিরোধিতা করে বাংলাদেশের আলিমগণ আবারও কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এ আন্দোলনের মূল দাবি হলো, রাষ্ট্রীয়ভাবে

কাদিয়ানিদের কাফির ঘোষণা করা, তাদের প্রকাশনা ও প্রচারণা নিষিদ্ধ করা, কাদিয়ানিদের জন্য ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা (যেমন : কাদিয়ানিদের উপাসনার জায়গাকে 'মসজিদ' না বলে 'উপাসনালয়' বলা)। ২০১৩ তে প্রকাশিত হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফার ৬ নম্বর দাবিটিও ছিল কাদিয়ানিদের নিয়ে। এ দাবিতে বলা হয়,

'সরকারিভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক সব অপতৎপরতা বন্ধ করা।' [2]

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ এবং সুশীলদের তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে আলিমদের এ দাবিগুলোর সমালোচনা ও বিরোধিতা করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো, কাদিয়ানিরা যদি নিজেদের মুসলিম মনে করে, তাহলে তাদের আত্মপরিচয় পরিবর্তন করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। এটি সরাসরি মানুষের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী এবং বাংলাদেশে সংবিধানের ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে সমান ও স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দমতো ধর্ম পালন ও প্রচারের স্বাধীনতা দেয়।[3] নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অধিকার আছে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের। কাজেই এ ধরনের দাবি প্রথমত নির্যাতনমূলক, দ্বিতীয়ত অসাংবিধানিক।

ইসলামের অবস্থান থেকে কাদিয়ানিদের কাফির হবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকলেও সেক্যুলার রাষ্ট্র এবং সংবিধানের জায়গা থেকে কাদিয়ানিদের পক্ষাবলম্বনকারীদের কথাগুলো উড়িয়ে দেয়া যায় না। কে মুসলিম আর কে মুসলিম না সেটা কি রাষ্ট্র ঠিক করবে? রাষ্ট্রের কি অধিকার আছে তাকফির[4] করার? কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের দাবি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈধতা যাচাই করার এখতিয়ার কি রাষ্ট্রের আছে? রাষ্ট্র যদি কাদিয়ানিদের কাফির ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাহলে কি সেটা–তাত্ত্বিকভাবে হলেও–অন্যদের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য হবে না?

অন্যদিকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কাদিয়ানিদের মুসলিম হিসেবে মেনে নেয়া একেবারেই অসম্ভব। কাদিয়ানিদের জন্য যেটা ধর্মীয় স্বাধীনতা মুসলিমদের জন্য সেটা জঘন্য ধর্মদ্রোহিতা। কাদিয়ানিদের তাদের সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষিত অধিকার দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র যদি তাদের মুসলিম হিসেবে মেনে নেয়, তাহলে রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, এ যুক্তি কিন্তু কেউ দিলেও দিতে পারে। রাষ্ট্র এখানে যার পক্ষই নিক না কেন, সেটা হবে কারও না কারও ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

যতই 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' বলা হোক না কেন, একটা সেক্যুলার রাষ্ট্রে সত্যিকার অর্থে ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকতে পারে না। সেক্যুলারিযম যা দিতে পারে তা হলো সেক্যুলার সংবিধানের অধীনে, সেক্যুলারিযমের সীমার ভেতরে থেকে কিছু নির্দিষ্ট বিশ্বাস, কথা ও কাজের স্বাধীনতা। ব্যাফোমেট কিংবা কাদিয়ানিদের নিয়ে ঘটনাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে এ সত্যটা আমাদের দেখিয়ে দেয়।

পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত হবার কারণে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার নীতি বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে আজ বিশ্বব্যাপী মেনে নেয়া হয়েছে। মধ্য যুগে ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চের নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি এবং খ্রিষ্টানের নিজেদের মধ্যেকার রক্তক্ষয়ী নানা বিরোধের প্রেক্ষাপটে জন্ম হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলারিযমের। ঔপনিবেশিক দখলদারত্ব এবং এর ফলে জন্মানো মানসিক দাসত্বের কারণে ধীরে ধীরে পুরো বিশ্বজুড়ে সেক্যুলারিযম পরিণত হয় রাষ্ট্র গঠনের একটি মৌলিক আদর্শিক ভিত্তিতে। সেক্যুলারিস্টদের যুক্তি হলো, রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিভিন্ন ধর্ম থাকতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র সব নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ। রাষ্ট্র কোনো একটি ধর্মকে গুরুত্ব দিলে অন্য ধর্মের নাগরিকরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও একঘরে ভাবতে পারে। ভাবতে পারে যে এর মাধ্যমে তাদের ওপর অন্য ধর্ম চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। হয়তো এতে করে নিজ নিজ ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে তারা বাধাগ্রস্ত হবে। পাশাপাশি তারা বৈষম্যের শিকার হতে পারে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রেও। যার ফলে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন সমস্যা ও সংঘর্ষ, যা বাধার সৃষ্টি করবে রাষ্ট্রের অগ্রগতির ক্ষেত্রে।

ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার নীতির সমর্থকরা মনে করে, রাষ্ট্রের জন্য সেক্যুলার অবস্থান নেয়াটাই সবচেয়ে ভালো। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে সমর্থন করবে না আবার কোনো ধর্মকে অস্বীকারও করবে না। রাষ্ট্রের জনগণ নিজেদের ইচ্ছেমতো বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ

করবে এবং নিজ নিজ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করবে। রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান নেবে, নিশ্চিত করবে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা।

ব্যাফোমেটের মূর্তির ক্ষেত্রে শয়তানি মন্দির ঠিক এ যুক্তিই ব্যবহার করেছে।

কিন্তু বাস্তবতা কি এ দাবিগুলো সমর্থন করে? আমরা এরই মধ্যে সেক্যুলার রাষ্ট্রে সব ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দাবির অসারতার প্রমাণ দেখেছি। এখন দেখা যাক সেক্যুলার রাষ্ট্র ঠিক কী ধরনের 'স্বাধীনতা' ধর্মগুলোকে দেয়।

৩.

স্কুলে কিশোর-কিশোরীদের একসাথে সাঁতার শেখার বাধ্যতামূলক ক্লাসে নিজেদের ১২ ও ১৪ বছর বয়সী মেয়েদের পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালে তুর্কী বংশোদ্ভূত সুইস নাগরিক বাবা-মাকে প্রায় ষোল শ পাউন্ডের মতো জরিমানা করে বসে সুইটযারল্যান্ডের এক স্কুল। দাবি করে, সাঁতার শেখার ক্লাস স্কুল কারিকুলামের অংশ, তাই সন্তানদের এ ধরনের ক্লাসে না পাঠানোর কোনো এখতিয়ার অভিভাবকদের নেই। জবাবে মামলা করে দেন দুই কিশোরীর বাবা-মা। তাদের যুক্তি হলো, পুরুষের উপস্থিতিতে একই সুইমিং পুলে মেয়েদের সাঁতার শেখা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী বৈধ না, স্কুল তাদেরকে এ ক্ষেত্রে বাধ্য করতে পারে না। এটা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অংশ। মামলা নাকচ করে দেয় সুইস আদালত। হাল না ছেড়ে তারা যান ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস (ECHR) এর কাছে। ইউরোপিয়ান কোর্টও রায় দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং সুইস আদালতের পক্ষে। রায়ে বলা হয়, অভিভাবকদের আপত্তি অগ্রহণযোগ্য এবং মুসলিম অভিভাবকরা তাদের কিশোরী মেয়েদের ছেলেদের সাথে একই সাঁতারের ক্লাসে পাঠাতে আইনত বাধ্য। ইউরোপিয়ান আদালতের বিচারকরা স্বীকার করে যে, অভিভাবকদের এভাবে বাধ্য করার কারণে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তবে আদালতের মতে, হস্তক্ষেপ হলেও এতে ধর্মীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন হচ্ছে না।[5] ঘটনাটা ২০১৭ এর।

তার কিছুদিন আগে ২০১৬ তে একই রকম মামলায় জার্মান আদালতের রায়ে বলা হয়, মুসলিম কিশোরীরা ছেলেদের সাথে সাঁতারের ক্লাস করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অব্যাহতি পাবার অধিকার তাদের নেই।[6] ২০১৬ তেই সুইটযারল্যান্ডের এক মুসলিম পরিবারকে প্রায় ৫,০০০ সুইস ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হয়, কারণ তাদের ১৪ ও ১৫ বছর বয়সী দুই ছেলে স্কুলের মহিলা শিক্ষকের সাথে হাত মেলাতে রাজি হয়নি। একই ধারাবাহিকতায় মিউনিসিপ্যাল কমিটির সাক্ষাৎকারে বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে হাত না মেলানোর কারণে ২০১৮ তে এক মুসলিম দম্পতির নাগরিকত্বের আবেদন বাতিল করা হয়।[7]

ইউরোপের ৭টি দেশসহ পৃথিবীর মোট ১৩টি দেশে নিক্বাব এবং বোরকা নিষিদ্ধ। এ ছাড়া মিসর, আলজেরিয়া, মরক্কো, বাংলাদেশসহ মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিক্বাব কিংবা বোরকা পরার কারণে নানান সময়ে মুসলিম নারীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে বৈষম্যমূলক আচরণের। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা অথবা বৈষম্যকে বৈধতা দেয়া হয়েছে কোনো না কোনোভাবে সেক্যুলারিযমের দোহাই দিয়ে। ২০১১ তে ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে নিক্বাবকে অবৈধ ঘোষণা করে ফ্রান্স। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোযি ঘোষণা করে, পর্দা নারীর দাসত্ব ও শোষণের চিহ্ন এবং সেক্যুলার ফ্রান্সে এর কোনো জায়গা নেই। কোনো মহিলা জনসম্মুখে নিক্বাব পরে বের হলে তাকে ১৫০ ইউরো ফাইন করা হবে। অভিভাবক বা স্বামী যদি কোনো নারীকে নিক্বাব করতে বাধ্য করে, তবে তাকে জরিমানা করা হবে ৩০,০০০ ইউরো।

২০১৪ সালে একজন ফ্রেঞ্চ মুসলিম নারী এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা করেন ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসে (ECHR)। সেই একই যুক্তিতে, এই আইনের কারণে তার ধর্মীয় অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কোর্টের রায়ে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়। একই রকম রায় দেয়া হয় বেলজিয়ামের নিক্বাব নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে করা আরেক মামলায় এবং ২০১৭ তে বেলজিয়ান কোর্টের দেয়া রায় বহাল রাখে ইউরোপিয়ান কোর্ট। সেক্যুলার কোর্টের সিদ্ধান্তে জানিয়ে দেয়া হয়, নিক্বাব নিষিদ্ধ করার কারণে ইসলামের বিধানের লঙ্ঘন হচ্ছে না!

যেসব দেশে এখনো নিক্বাব নিষিদ্ধ করা হয়নি, যেমন ব্রিটেন, সেগুলোতেও জোর বিতর্কচলছে নিক্বাব নিষিদ্ধ করে নতুন আইন বানানোর ব্যাপারে।[8]

এসবের পাশাপাশি তালাক কিংবা মসজিদ নিয়েও ফতোয়া দিয়েছে সেক্যুলার আদালত।

2017 এর এক রায়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করে তিন তালাক অসাংবিধানিক এবং অনৈসলামিক! [9] ২০১৮ তে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৫ সালে বাবরি মসজিদ-বিষয়ক একটি মামলার রায় বহাল রাখে যেখানে বলা হয়েছে, 'মসজিদ ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অংশ নয়। মুসলিমরা যেকোনো জায়গায় নামায পড়তে পারে।'[10]

লক্ষ করুন, প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিমরা কোনো আইন ভঙ্গ করেনি। তারা কেবল নিজেদের ধর্মের বিধান মানার চেষ্টা করেছে। সেক্যুলার ইউরোপ, ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়া ইউরোপ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, আলাদাভাবে নতুন আইন তৈরি করে কিংবা ফাইন করে মুসলিমদের বাধা দিয়েছে তাদের ধর্ম পালনে। ভারতের ক্ষেত্রে কোনটা ইসলামের অংশ এবং কোনটা না তা নিয়েই ফতোয়াবাজি শুরু করেছে সেক্যুলার সুপ্রিম কোর্ট। এই হলো সেক্যুলারিযমের দেয়া ধর্মীয় স্বাধীনতার বাস্তবতা। সেক্যুলারিযম এমন ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলে যেখানে একসাথে অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে কিশোর-কিশোরীদের সাঁতার শেখা, পরপুরুষ কিংবা পরনারীর হাত ধরা ইসলামী শিক্ষা ও বিধানের লঙ্ঘন কি না সেটা ঠিক করে দেয় সেক্যুলার সংসদ কিংবা আদালত। তিন তালাক কিংবা মসজিদ–ইসলাম ধর্মের অংশ কি না সেটাও সেক্যুলার আদালতই ঠিক করে। যে নারী নিক্বাব করতে চায়, সরকার তাঁকে বাধ্য করে নিক্বাব খুলতে, শোষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য! অর্থাৎ ধর্ম কী বলছে সেক্যুলার রাষ্ট্রে সেটা মূল্যহীন, এমনকি যে বিষয় ধর্মের আওতাভুক্ত বলে সেক্যুলাররিযম স্বীকার করে নেয়, সে ক্ষেত্রেও। ধর্মের কতটুকুপালনযোগ্য আর কতটুকুনা, সেক্যুলার সংসদ আর আদালত সেটা ঠিক করবে সেক্যুলার সংবিধান অনুযায়ী। ধর্মের সীমানা ঠিক করে দেবে সরকার।

ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বললেও সেক্যুলারযিম আসলে ধর্মকে নিজের অধীনস্থ করে। রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথক্করণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। প্রত্যেক সেক্যুলার রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি ধর্ম সেক্যুলার সংবিধান, সংসদ ও সরকারের অধীনস্থ। সেক্যুলার সংবিধানের অধীনে যে ধর্মীয় 'স্বাধীনতা' দেয়া হয় সেটা হলো গোলামকে দেয়া মনিবের স্বাধীনতার মতো। মনিবের মেজাজ-মর্জিমতো এ 'স্বাধীনতা' গায়েব হয়ে যেতে পারে যেকোনো সময়।

৪.

সেক্যুলারিযম বলে রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান নেবে। 'Render unto Caesar the things that are Caesar's, and unto God the things that are God's.' ব্যক্তি তার মতো করে ধর্ম পালন করবে, আর রাষ্ট্র চলবে রাষ্ট্রের নিয়মে। রাষ্ট্রের কাজে ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না। ধর্ম থাকবে চার্চ, সিনাগগ, মসজিদ আর মন্দিরে। ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে যা ইচ্ছে সংবিধান মানুক–বাইবেল, তাওরাত, গীতা, কুরআন, কোয়ান্টাম মেথড, স্যাটানিক বাইবেল–কিচ্ছু যায় আসে না। রাষ্ট্রের চোখে সব সমান। কিন্তু শাসন, বিচার, আইন চলবে রাষ্ট্রের সংবিধান দিয়ে। এই সংবিধানই সার্বভৌম। এই মানবরচিত সর্বোচ্চ আইনের ওপর আর কারও কথা চলবে না। হোক সে আল্লাহ, সদাপ্রভু, জিহোভা কিংবা ব্যাফোমেট। এই হলো সেক্যুলারিযম, আর আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র।

কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। রাষ্ট্রের আইনগুলো গড়ে ওঠে নৈতিকতার কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর। সেক্যুলার আইন বানাতে হলেও ভালোমন্দের একটা মাপকাঠি বেছে নিতে হয়। রাষ্ট্রের যেহেতু সমাজ ও মানুষকে নিয়ে কাজ করতে হয় তাই তার প্রয়োজন হয় একটা দর্শন এবং বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিরও। সেক্যুলার রাষ্ট্র কোন নৈতিকতা, মাপকাঠি ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে?

বাস্তবতা হলো, যেসব মূল্যবোধ ও প্রাথমিক মূলনীতিলোকে ভিত্তি করে সেক্যুলার আইন গড়ে ওঠে সেগুলো কোনো না কোনো

সাংস্কৃতিক কিংবা ঐতিহাসিক ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত। ইউরোপ যেমন প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রের আইন বানানোর ক্ষেত্রে নিজেদের কিছু কিছু ধর্মীয় (খ্রিষ্টধর্ম) মূল্যবোধকে গ্রহণ করেছে। আজও পশ্চিমা বিশ্বের পররাষ্ট্র নীতি, বিশেষ করে মুসলিমবিশ্বের ব্যাপারে তাদের পলিসিগুলোর ওপর খ্রিষ্টীয় প্রভাব স্পষ্ট। পাশাপাশি তাদের সংবিধানগুলো গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী দর্শন এবং এনালাইটেনমেন্টের আদর্শের ওপর। সময়ের সাথে সাথে খ্রিষ্টধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব কমেছে, বেড়েছে এনলাইটেনমেন্টের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া ভোগবাদ, বস্তুবাদ আর লিবারেলিযমের প্রভাব। উপমহাদেশের দিকে তাকান। বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও সুশীল সমাজ সেক্যুলারিযম ও অসাম্প্রদায়িকতা বলে যা বোঝায় সেটাকে মোটাদাগে কলকাতার হিন্দু এলিটদের অনুকরণ বললে ভুল হবে না।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইসলামের সাথে এ সবগুলো দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক অথবা আদর্শিক দ্বন্দ্ব আছে। কোপটা তাই বেশী পড়ে ইসলামের ওপরেই। স্বাধীনতার বুলি আওড়ে ইসলামের সমালোচনা করলেও, বিভিন্ন অজুহাতে মুসলিমদের তাদের ধর্মীয় বিধান পালনে বাধা দেয় ইউরোপিয়ান দেশগুলো। সেক্যুলারিযমের কথা বলে ভারতীয় আদালত তালাক আর মসজিদ ইসলামী নাকি অ-ইসলামী, তা নিয়ে ফতোয়া দেয় । ইসলামকে আক্রমণ করাকে আরব ও পাকিস্তানের সেক্যুলারিস্টরা মনে করে নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব। এ কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা ফোন ধরে 'হ্যালো' না বলে সালাম দিলে, 'বাই' না বলে 'আল্লাহ হাফেয' বললে, ছেলেদের গোড়ালি আর মেয়েদের মাথার ওপর কাপড় থাকলে–রীতিমতো গবেষণা করে সেটাকে 'ইসলামী উগ্রবাদ' নাম দেয়া হয়, ফলাও করে প্রচার করা হয় জাতীয় পত্রিকায়।[11]

সেক্যুলার রাষ্ট্র ধর্মগুলোর ওপর তার নিজস্ব সেক্যুলার মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়। সব ধর্মের অধিকার সংরক্ষণের বদলে সেক্যুলারিযম সব ধর্মকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ধর্মের কোনো বিধানের সাথে সেক্যুলার আইন সাংঘর্ষিক হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে সেক্যুলার আইন ধর্মকে বাধ্য করে সেই আইন মেনে নিতে। সেক্যুলারিযমের নিজস্ব হারাম-হালালের কনসেপ্ট আছে। সে আপনার ওপর সেটা চাপিয়ে দেবে। নিজের ধর্মের বিধান আপনি ভাঙতে পারবেন, কিন্তু সেক্যুলার বিধান ভাঙা যাবে না; মানতেই হবে। আপনি মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান যা-ই হন না কেন। যার বেশ অনেকগুলো উদাহরণ নিয়ে আমরা এরই মধ্যে দেখেছি।

আদতে এটা ধর্মনিরপেক্ষতা না; বরং স্বতন্ত্র একটা ধর্মের মতো। যে ধর্মের নাম হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, যে ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হলো সংবিধান। ব্যাবিলনের নমরুদ আর মিসরের ফিরাউনদের মতো যে ধর্মের দেবতা হলো সেক্যুলার শাসক ও সংসদ। সেক্যুলার রাষ্ট্র কার্যত বাকি সব ধর্মকে এই নতুন ধর্ম এবং এর 'পবিত্র গ্রন্থের' অধীনস্থ করে। আর এ কারণেই সেক্যুলার ধর্ম অনুযায়ী রাষ্ট্র ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে, ধর্মের বিধান বদলে দিতে পারে, ধর্মকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে পারে, এমনকি আদালত এটাও ঘোষণা করতে পারে যে মসজিদ ইসলামের অংশ না। কিন্তু একজন মুসলিম তার ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে সংবিধানের বিরোধিতা করতে পারে না, সেটা অপরাধ। আল্লাহর আইন উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু আদালতের রায়ের ব্যতিক্রম করা যায় না।

৫.

রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক করার এ মতাদর্শের ব্যাপারে মুসলিমদের অবস্থান কী হবে?

কার আইন প্রাধান্য পাবে? কার বিধান মেনে চলা হবে? কার কর্তৃত্বের কাছে আমরা বশ্যতা স্বীকার করব?

সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কে? আইনপ্রণেতা কে?

বিধানদাতা কে?

এ ব্যাপারে সেক্যুলার দর্শনের অবস্থান পরিষ্কার।

অন্যদিকে এ ব্যাপারে কুরআনের অবস্থানও স্পষ্ট। [12] আর এ স্পষ্ট বিষয়টির ব্যাপারে যারা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে তাদের জন্য বিষয়টি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট করেছেন তাতারদের বিরুদ্ধে দেয়া তার ঐতিহাসিক ফতোয়ায়, যেখানে ইসলামী শরীয়াহর বদলে ইয়াসিক নামের সংবিধান দিয়ে শাসন করার কারণে তিনি তৎকালীন শাসকদের কাফির ঘোষণা করেছিলেন।[13]

ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস হলো কুরআন শতভাগ আল্লাহর কালাম এবং সুন্নাহ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আল্লাহর দিকনির্দেশনার ফল। ইসলাম রাষ্ট্র থেকে আলাদা হতে পারে না, কারণ মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টিও ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামে ব্যক্তিগত, সামাজিক আর রাজনৈতিক–আলাদা কিছু না। প্রতিটি ক্ষেত্রকেই নিয়ন্ত্রণ করে শরীয়াহ। এই ইউরোপীয় শ্রেণিবিভাগ, ইউরোপীয়দের জন্য; মুসলিমদের জন্য না। মুসলিমদের কাছে 'ধর্ম' নিছক কিছু বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি না। মুসলিমদের জন্য ইসলাম হলো এমন এক জীবনাচার, এমন এক জীবনব্যবস্থা, বিশ্বাসের পাশাপাশি মূল্যবোধ, আচরণ এবং জীবনযাপনের সকল দিক যার অন্তর্ভুক্ত।

ইউরোপের অন্ধকার যুগ ছিল মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ। ইউরোপের দুরবস্থার পেছনে ছিল চার্চের সক্রিয় ভূমিকা, অন্যদিকে মুসলিমদের পতনের কারণ ছিল ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ। রোমান ক্যাথলিক চার্চকে আত্মার পরিত্রাণের একমাত্র বাহন বলে বিশ্বাস করা, ক্যাথলিসিযমের মৌলিক বিশ্বাসের একটি। ইসলামে পুরোহিততন্ত্রের কোনো ধারণাই নেই। শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা বা দিকনির্দেশনা খ্রিষ্টধর্ম দেয় না। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, সবকিছুর ব্যাপারে ইসলামের আছে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও হুকুম। মুসলিমদের আছে এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে গৌরবোজ্জ্বল ইসলামী রাষ্ট্রের ইতিহাস। গণতন্ত্র বা সেক্যুলারিযম ছাড়াই এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে পৃথিবী শাসন করেছে মুসলিমরা। ইউরোপের অন্ধকার যুগের প্রেক্ষাপটে জন্ম নেয়া সেক্যুলারিযম মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য না। সেক্যুলারিযমকে প্রত্যাখ্যান করতে মুসলিমরা বাধ্য, কারণ সেক্যুলারিযম আল্লাহর আইনকে অকার্যকর করে; বাতিল সাব্যস্ত করে।

এখানে যে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, ইসলামী রাষ্ট্রে শরীয়াহর নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী কিছু কাফিররা তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে। এ ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম মেনে বসবাস করা কাফিরদের নিরাপত্তা দেয়া ও শরীয়াহ তাদেরকে যে অধিকার দেয় সেটা সংরক্ষণের দায়িত্বও রাষ্ট্রের।

পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষরা এ ক্ষেত্রে বলবে ইসলামী আইন সবাইকে সমান অধিকার দেয় না। যেমন ধরুন, একজন কাফির কখনো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারবে না। বেশ, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থান তো একই। কোনো মুসলিমও তো সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারে না। কারণ, রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য একজন মুসলিমকে তার বিশ্বাসের অনেক কিছু বর্জন করতে হয় এবং সেক্যুলারিযম নামের এ ধর্ম ও এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ সংবিধানকে স্থান দিতে হয় ইসলাম, কুরআন ও সুন্নাহর ওপর। তা ছাড়া ধর্মীয় স্বাধীনতার গালভরা ফাঁকা বুলির আড়ালে আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রও কিন্তু সেক্যুলার সংবিধানের নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সুযোগই দেয়। তাই একটাকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বলা আর অন্যটাকে ধর্মীয় স্বাধীনতা বলা বুদ্ধিবৃত্তিক বাটপারি।

ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো অর্থেই মুসলিমদের জন্য সমাধান হতে পারে না। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দাবি করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে মুসলিমদের মানুষের বানানো সম্পূর্ণ আলাদা বিশ্বাস কাঠামো ও আইন গ্রহণ করতে হবে। মুসলিমদের পক্ষে কখনোই রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথক্করণ মেনে নেয়া সম্ভব না। কারণ, এটা আল্লাহর বিধান বাতিল করে মানুষের বিধানের আনুগত্য করতে বলে[14]।

৬.

আমাদের দেশে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়–সব জায়গায় ধর্ম টেনে আনবেন না।

কথাটা আসলে উল্টো। আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্র একে একে সব জায়গা থেকে ধর্মকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়েছে। সেক্যুলার রাষ্ট্রের আবির্ভাবের আগে এ জায়গাগুলো ধর্মের ছিল। সেক্যুলারিযম সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে তো সরিয়েছেই, এখন হস্তক্ষেপ করছে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম পালনের ওপরও। ফতোয়া দিচ্ছে ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে।

তাই সব জায়গায় ধর্ম টেনে আনবেন না কথাটা অনেকটা দখলদার ইস্রায়েলের রেটোরিকের মতো। দেখবেন ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালানোর সময় ইস্রায়েলি আর্মি ও সরকারের বিভিন্ন মুখপাত্র বলছে, 'ইস্রায়েলের নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অধিকার আছে। ইস্রায়েলের অধিকার কাছে নিজেকে রক্ষা করার।' যেন আগ্রাসন চালাচ্ছে ফিলিস্তিনের মুসলিমরা আর নিরীহ, শান্তিকামী ইস্রায়েল কেবল নিজেকে রক্ষা করছে! অথচ বাস্তবতা হলো ইউরোপ থেকে আসা ইহুদীরা ইস্রায়েলের নামে ফিলিস্তিনের মাটি ছিনিয়ে নিয়েছে, দখল করে রেখেছে মুসলিমদের পবিত্র স্থান মাসজিদ আল-আক্বসা এবং মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালিয়ে আসছে সাত দশকের বেশি সময় ধরে। এতকিছুর পর মুসলিমরা যখন মসজিদ এবং মাটি ফিরিয়ে নিতে চায়, দখলদারি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তখন ইস্রায়েল বলে–'ইস্রায়েলের অধিকার কাছে নিজেকে রক্ষা করার!' সব জায়গায় ধর্ম টেনে আনবেন না–কথাটা ইস্রায়েলের এই 'নিজেকে রক্ষা করার অধিকারের' কথার মতো। এমন এক মুখস্থ বুলি যা শব্দের চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবতাকে উল্টে দেয়।

প্রশ্নটা সব জায়গায় ধর্ম আনার না, প্রশ্নটা হলো আপনারা সব জায়গা থেকে ধর্মকে সরাতে চান কেন? আর যদি চান-ই, তাহলে সেটা সরাসরি স্বীকার করেন না কেন?

মুসলিম হিসেবে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত, আমরা কি সেক্যুলার হয়ে সব জায়গা থেকে ধর্মকে সরাতে চাই? কিংবা চিন্তার কোনো বিচিত্র চোরাবালিতে নেমে স্বপ দেখি সেক্যুলারিযমের কাঠামোর ভেতর ইসলাম 'টিকিয়ে রাখার'?

নাকি আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করতে চাই ইসলামের?

~চিন্তাপরাধ বইতে প্রকাশিত

* * *

[1] এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *কাদিয়ানি মতবাদ (পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ)*, শাইখ ইহসান ইলাহী যহীর;

কাদিয়ানী সম্প্রদায় কেন মুসলমান নয় (তিন পর্ব), *মাসিক আল-কাউসার*, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৫, ৭ ও ৮; কাদিয়ানী ধর্মমত : সমস্যা উপলব্ধি ও সমাধানের সহজ পথ, *মাসিক আল-কাউসার*, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২; কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও জাতীয় দৈনিকের বিজ্ঞাপন : একটি পর্যালোচনা (দুই পর্ব), *মাসিক আল-কাউসার*, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২ ও ৯

[2] হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ : ১৩ দফা দাবি,
https://bn.wikipedia.org/wiki/হেফাজতে_ইসলাম_বাংলাদেশ#১৩_দফা_দাবী

[3] ২ ক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[4] কাউকে কাফির ঘোষণা করা

[5] Muslim parents must send children to mixed swimming lessons, court rules, Politico, November 1, 2017

[6] Germany's top court rules Muslim schoolgirls must join swimming lessons, Reuters, December 8, 2016

[7] Swiss ruling overturns Muslim pupils' handshake exemption, *The Guardian*, Wed 25 May 2016
After refusing a handshake, a Muslim couple was denied Swiss citizenship, *The Washingto Post*, August 18,

2018

[8] The Islamic veil across Europe, BBC, 31 May 2018

[9] ভারতে তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ, চূড়ান্ত রায়ে সুপ্রিম কোর্ট, বিবিস বাংলা, ২২ অগাস্ট ২০১৭

[10] Dr. M. Ismail Faruqui Etc, Mohd. ... vs Union Of India And Others on 24 October, 1994

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়, মসজিদ নামাজের জন্য অপরিহার্য নয়, ঢাকা ট্রিবিউন, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৮

[11] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উগ্রবাদের প্রভাব প্রকট, *প্রথম আলো*, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭

[12] *'...আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত কোরো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'* (সূরা ইউসুফ, ৪০)

'...আল্লাহ বিচার করেন, আর তাঁর বিচারকে (হুকুম) পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই।' (সূরা আর-রা'দ, ৪১)

'...তিনি নিজ হুকুম ও বিধানের কর্তৃত্বে কাউকে শরিক করেন না।' (সূরা আল-কাহফ, ২৬)

'তারা কি জাহেলী যুগের বিচার-ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?' (সূরা আল-মায়'ইদা, ৫০)

'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন–ওর মীমাংসা তো (হুকুম) আল্লাহরই নিকট।' (সূরা আশ-শূরা, ১০)

'...যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।' (সূরা আল আন'আম, ১২১)

ইমাম ইবনু কাসির বলেছেন, আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা কুফর, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা আছে। তিনি বলেছেন, *'অতএব কেউ যদি খাতুমুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ওপর নাযিলকৃত শরীয়াহ ছেড়ে পূর্বে নাযিলকৃত অন্য কোনো শরীয়াহ দ্বারা বিচার করে ও শাসনকার্য চালায়, যা রহিত হয়ে গেছে, তবে সে কাফির হয়ে গেছে। তবে (চিন্তা করুন) সেই ব্যক্তির অবস্থা কীরূপ যে আল-ইয়াসিকের ভিত্তিতে শাসন করে এবং একে ইসলামী শরীয়াহর ওপর স্থান দেয়? এ রকম যে-ই করবে সে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফির। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, "তারা কি জাহেলী যুগের বিচার-ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?"* (সূরা আল-মায়'ইদা, ৫০)', ইমাম ইবনু কাসির, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৩/১১৯। মাকতাবা আল মা'আরিফ, বৈরুত। সপ্তম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি।

[13] 'এটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহর শরীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণকে বৈধতা দেয়, সে কাফির। আর তার কুফর হলো ওই ব্যক্তির কুফরের ন্যায় যে কিতাবের কিছু আয়াত বিশ্বাস করে আর কিতাবের অন্য কিছু আয়াত অস্বীকার করে'। শাইখ আল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমু' আল ফাতাওয়া*, ২৮ নম্বর ভলিউম, পৃষ্ঠা নম্বর ৫২৪। প্রিন্টিং : খাদিম আল হারামাইন আল শারিফাইন আল মালিক ফাহাদ বিন আব্দুল আযিয আল সাউদ। ১৪২৫ হিজরি।

[14] এ অংশের কিছু আলোচনা শাইখ জাফর ইদ্রিসের Separation Of Church & State শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা হয়েছে।